SIXTH KRISHNA BHATTACHARYA MEMORIAL LECTURE 2019

কন্যাশ্রী
ও
সামাজিক পরিবর্তন

Lecture *by* **Maneesha Bandopadhyay**

Educationist of Bolpur, West Bengal

SIXTH KRISHNA BHATTACHARYA MEMORIAL LECTURE 2019

কন্যাশ্রী ও সামাজিক পরিবর্তন

মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্যাশ্রী কী ?

নমস্কার! অসামান্য শিক্ষাব্রতী ও নারীদের আত্মবিকাশের আন্দোলনের কর্মী কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত আজকের স্মারক বক্তৃতায় আমার মতো সামান্য একজন মানুষকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আয়োজকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সঙ্গে আগাম মার্জনা চেয়ে রাখি, আপনাদের সম্ভাব্য আশাভঙ্গের জন্য।

আমাকে বলতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্প, কন্যাশ্রী নিয়ে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তরা হচ্ছে ১৩- ১৮ বছর বয়সী সমস্ত ছাত্রী। এ বিষয় নিয়ে আমার কথা বলার

যোগ্যতা কেবল এতটুকুই যে দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা আমি তাদের জন্য দায়বদ্ধ থাকি – প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে। লাভপুর সত্যনারায়ণ শিক্ষানিকেতন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের গত শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১২১০। এর মধ্যে সাতশোর মতো মেয়ে কন্যাশ্রী-র আওতায়। এদের অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন সুবিধা-অসুবিধার দেখাশোনার সূত্রে প্রকল্প সম্পর্কে আমার অবগতি ও এ সম্পর্কে একটি ধারণার গঠন।

সাধারণ ভাবনায় কন্যাশ্রীও আর পাঁচটা জনমোহিনী – পপুলিস্ট – প্রকল্পের মতো একটা কর্মসূচি। ইদানিং যদিও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত লাতিন আমেরিকাতে, জনমোহিনী রাজনীতি নিয়ে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে, আমাদের দেশে বিশেষত সমাজের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত – এলিট – অংশের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাই অধিকতর প্রকট। পাইয়ে দেবার রাজনীতির নামে কথিত নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কখনো গ্যাসে ভর্তুকি দেওয়া হয়, কখনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় উদ্ধার করা কালো টাকার ভাগ দেবার,

আবার কখনো ক্লাবকে উৎসবের জন্য দেওয়া হয় অর্থ। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, কন্যাশ্রী-তে পাইয়ে দেবার ব্যাপার ভালমতোই থাকা সত্ত্বেও এটি বিশিষ্টভাবে স্বতন্ত্র। প্রথমত, এখানে সম্পদের পুনর্বন্টনের ব্যবস্থাটা এমন ভাবে করা যাতে সুফলের ভাগ পৌঁছে যাচ্ছে সমাজের সবচেয়ে নীচুতলার বাসিন্দাদের কাছে। এদের প্রান্তিকতার স্বরূপ দু-ভাবে নির্মিত: একটির স্বরূপ মেয়ে হিসেবে, এবং অন্যটি তাদের বেশির ভাগেরই সমাজের সর্বাধিক নিপীড়িত অংশ, দলিত, আদিবাসী ও মুসলমান হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যায় দলিত-আদিবাসী-মুসলমান মিলে ৫৬ শতাংশ; গ্রামাঞ্চলে, স্বাভাবিক কারণেই, আরো অনেক বেশি - প্রায় তিন চতুর্থাংশ। সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও, এবং সামাজিক উৎপাদনে তাঁদের বিপুল অবদান থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক ফলগুলো থেকে তাঁরা বঞ্চিত। সম্পদের পুনর্বন্টনের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে কিছু পৌঁছানো মানে, তাই, পাইয়ে দেওয়া নয়, বরং তাঁদের ন্যায্য অধিকারের কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়া। এবং সেই পুনর্বন্টিত সম্পদের সর্বাধিক ফলবান হয়ে ওঠার সম্ভাবনার দ্বারটা উন্মুক্ত

করে দেওয়া সেই সম্পদকে – সব থেকে বঞ্চিত অথচ সব চেয়ে বেশি সামাজিক সম্ভাবনাময় অংশ – মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, এটি একটি শর্তাধীন নগদ হস্তান্তর প্রকল্প (Conditional Cash Transfer) যেখানে প্রাপকের উপর দুটি প্রধান শর্ত দেওয়া আছে । শর্ত এক, প্রাপিকা মেয়েটিকে বিয়ের জন্য আইনানুগ ন্যূনতম বয়স আঠারো হতেই হবে, অর্থাৎ, আঠারো বছর বয়সের আগে তার বিবাহিতা হওয়া চলবেনা। আর দ্বিতীয় শর্ত, তাকে কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া চালিয়ে যাওয়া অবস্থায় থাকতে হবে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শর্ত কন্যাশ্রীর মূল দুটি লক্ষ্য, বাল্যবিবাহ কমানো ও মেয়েদের আত্মবিকাশের পথে এগোনোর জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করে।

২০১৩ সাল থেকে চালু করা হয় কন্যাশ্রী প্রকল্প। বর্তমানে রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরেও অতিচর্চিত। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপের একটি বিভাগে প্রথম

পুরস্কার পাওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলেও প্রকল্পটি নজর কেড়েছে। তেরো বছর বয়সে অষ্টম শ্রেনীতে ছাত্রীরা কন্যাশ্রী – ১ (K1) এর জন্য নাম নথিভুক্ত করে। অবিবাহিতা সার্টিফিকেট দেন পঞ্চায়েত দপ্তর , পাঠরত অবস্থার সার্টিফিকেট দেন বিদ্যালয়ের প্রধান । প্রতিবছর এটিকে নবীকরণ করতে হয়।প্রকল্পের আবশ্যিক শর্ত মেয়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা। বছরে সাড়ে সাতশো টাকা এই অ্যাকাউন্টে যায় । ১৮ বছর বয়স হলে কন্যাশ্রী ২ (K2)-র আওতাধীন হয়ে ওই অ্যাকাউন্টে ২৫,০০০ টাকা আসে । তার জন্য অবিবাহিত থাকা ও পাঠরত থাকা দুটি শর্তই বাধ্যতামূলক।

পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গে বাল্য বিবাহের ঘটনা অত্যন্ত বেশি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে – ৪ (NFHS 4) – এর তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে প্রতি পাঁচটি মেয়ের মধ্যে দুজনের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়। অপর সমস্যাটি স্কুল ছুটের। দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিকে ছেলে ও মেয়ে প্রায় সমান অনুপাতে ভর্তি হলেও উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকে মেয়েদের সংখ্যা কমতে থাকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই অবস্থা অত্যন্ত প্রকট এবং স্বাভাবিক ভাবেই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থায় আছে বিশেষত আদিবাসী ও দলিত মেয়েরা – মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুল ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের অংশ মোটামুটি সমতাপূর্ণ, কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিকে এসে অনুপাতটা ভয়ানক রকম বিষমানুপাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

কন্যাশ্রীর চারটি ঘোষিত উদ্দেশ্য যা ওয়েবসাইটে দেখা যায়, তার একটি হল মেয়েদের শিক্ষা লাভ করার সময়টি বাড়ানো অর্থাৎ তাদের স্কুলজীবনটি দীর্ঘ করা। আঠারো বছর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া হয়ে যায়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল আইনী বিবাহের বয়সের আগে বিয়ে যেন না হয়। যাতে অল্প বয়সে গর্ভধারণ, মা ও শিশুর মৃত্যু হার কমানো ও অপুষ্টি জনিত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। তৃতীয় উদ্দেশ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের আত্মবিকাশ। অর্থ সরাসরি তার অ্যাকাউন্টে গেলে সে নিজের খুশী মতো তা খরচ করতে পারবে। চতুর্থ উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের ইতিবাচক ভুমিকা নিশ্চিত করতে মেয়েদের নিয়ে

বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন কন্যাশ্রী ক্লাব, কন্যাশ্রী মেলা, ক্যারাটে শেখা, বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা অভিযানে যোগদান, প্রভৃতির আয়োজন।

কন্যাশ্রীর প্রভাব

সাধারণ ভাবে যারা সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ সেই মেয়েদের অধিকার অতি সীমিত। সম্পত্তির অধিকার নেই বললেই চলে। বহিঃসংযোগও সীমিত। সমাজ মেয়েদের সম্পর্কে চিরাচরিত পশ্চাদমুখী ভাবনায় আচছন্ন। ছেলের তুলনায় মেয়েকে আজও - এতো প্রচার সত্ত্বেও – চিরাচরিত ভাবে চলে আসা প্রথার কারণে প্রায়শই মানুষ বলে গণ্যই করা হয়না । সেই সমাজে কন্যাদায় থেকে কন্যাশ্রী হয়ে ওঠা একটি সামাজিক পরিবর্তন তো অবশ্যই। "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" প্রকল্পে বেটির অসহায়তাই মুখ্য – সে প্রাপিকা মাত্র, অনুকম্পার পাত্রী, তার নিজের জন্য নিজের কিছু করতে পারার মতো সক্ষমতা অর্জন যে হতে

পারে, প্রকল্প তা মনে করেনা। কিন্তু কন্যাশ্রী মেয়েদের আত্মবিকাশের দিকেই বেশি জোর দিয়েছে। গোটা সরকারী ব্যাবস্থাকে এই প্রকল্পের জন্যে উদ্যোগী করে তোলায় সমাজে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। যাতে কেউ বাদ না পড়ে তার জন্য স্কুল তো বটেই, পঞ্চায়েত ক্লাব, স্কুল, শিক্ষা দপ্তর , এমন কি পুলিস প্রশাসনও যথেষ্ট তৎপর। কন্যাশ্রী যোদ্ধা বা কন্যাশ্রী ক্লাব তৈরী করে ছাত্রীদল বাল্য বিবাহ বন্ধ করা থেকে স্কুলে মেয়েদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বহু গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। কন্যাশ্রী চালু হওয়ার পর স্কুল ছেড়ে দেওয়া মেয়েরাও কেউ কেউ আবার ভর্তি হয়েছে। এমন ঘটনাও আছে যেখানে কম বয়সে বিয়ের পর কোনো কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া মেয়েরাও আবার স্কুলে ভর্তি হয়েছে ।

১৩ – ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে স্কুলে পড়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদের অধিকাংশই লেখা পড়া জারি রাখতে পারেনা, বিয়ের পরও

যে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে, এই কল্পনার বিস্তার ঘটেনি। বিপরীতে অবিবাহিত মেয়েদের বেশিরভাগেরই নাম স্কুলের খাতায় আছে। পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ এবং নারীপাচার দুটিরই পরিসংখ্যান বিপজ্জনক। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের নাম করে মেয়ে পাচার করা হয়।

বর্তমানে কন্যাশ্রীর আওতায় সমস্ত মেয়ে এসে যাওয়ায় (পরিবারের আর্থিক অবস্থা যাই হোক) স্কুল স্তরে এর আলোচনা বেড়েছে। যেহেতু অন্যান্য স্কলারশিপের মতো এখানে ভালো নম্বর পাওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তাই সকলেই এই প্রকল্পের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।

এই দৃশ্যমানতা স্কুলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের প্রাধান্য থাকায় পারিবারিক যে কোনও প্রয়োজনে উৎসব অনুষ্ঠান জন্ম মৃত্যু শিশু পালন শুশ্রুষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনায়াসে মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করা যায়। কন্যাশ্রীর মেয়েদের ক্ষেত্রে উপস্থিতি যেহেতু একটি মাপকাঠি, প্রধান শিক্ষিকা তার পক্ষে সই করবেন, ফলে মেয়েটি

অন্তত স্কুলের পরিসরে দৃশ্যমান হয়। নিয়মিত উপস্থিতি বাল্য বিবাহ ও নারী পাচারের ঘটনায় যেমন হ্রাস ঘটায়, তেমনি ঘর থেকে দূরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার মনোজগতের সীমা প্রসারিত হয়।একটি মেয়ের মেয়ে হওয়া নয়, মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভুমিকা অপরিসীম। সে পাশ-ফেল যাই করুক, নম্বর যেমনই পাক, তার মনের আকাশটি কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে বিস্তৃত হতে থাকে। সেখানে সে খেলাধুলা করে বন্ধুদের সঙ্গে মেশে, স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এখানে বলে রাখা ভাল যে ফেল প্রথা চালু হলে কিন্তু স্কুলছুট আরও বাড়বে।

Economic and Political Weekly তে প্রকাশিত অনিন্দিতা সেন ও অরিজিতা দত্তের প্রবন্ধ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কন্যাশ্রী প্রাপকদের স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে। আবার দেখা যাচ্ছে, এই সব মেয়েদের উপর পরিবারের তরফে বিয়ে দেবার চাপও কমেছে। মেয়েরা নিজেরাই এই ধরনের চাপকে প্রতিহত করতে পারছে। এরকম ভাবা হয়ে

ছিল যে, কন্যাশ্রীর টাকা হয়তো বা বিয়ের পণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে প্রধানত উচ্চশিক্ষার জন্যই চাকরির প্রশিক্ষণে এই টাকা খরচ হচ্ছে। যেখানে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় যাচ্ছে না সেখানেও টাকাটা বিয়েতে খরচ না করে জমিয়ে রাখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের কাছে এইটুকুই তো সম্পদ।

একটি আদিবাসী মেয়েকে জানি যে কন্যাশ্রীর টাকা এবং বাবার কাছ থেকে নেওয়া কিছু টাকা মিলিয়ে একটি মোটর বাইক কিনেছে যাতে তার চলাচল সুগম হয়। কলেজে যাওয়া মেয়েরা ল্যাপটপ বা উন্নত মোবাইল যা পড়াশোনার সহায়ক, তার জন্য এই টাকা খরচ করেছে।

এই যে নিজের জগতকে বড় করার জন্য কন্যাশ্রীর অর্থকে কাজে লাগানো, এর ফলে এই মেয়েদের একটি নিজস্ব পরিসর তৈরী হচ্ছে। কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে ও মাতৃত্বের দায় ভার বহন করা, শিশুশ্রমিক হয়ে ওঠা, গেরস্থালীতে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া, পাচারের শিকার হওয়া – কন্যাশ্রী এর বাইরে যাবার পথ দেখায় । অনাগত দিনে তার প্রভাব সমাজে পড়বেই।

রূপায়ণের সমস্যা

এত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও রূপায়ণগত দুর্বলতার কারণে এর সুফলের মাত্রা অনেকটা সীমিত থেকে যাচ্ছে। রূপায়ণগত সমস্যা দুই প্রকার – এক, বৃহত্তর কল্পনার অভাব, দুই, এরই সঙ্গে সম্পর্কিত, পরিকাঠামোগত খামতি।

প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব রয়েছে একদিকে স্কুল, অন্যদিকে সরকারি স্তরে পঞ্চায়েত এবং ব্লকের উপর । কোনো প্রতিষ্ঠানেই এর জন্য বিশেষ কোনো কর্মী নেই। স্কুলগুলি এমনিতেই শিক্ষকের অপ্রতুলতায় ভুগছে। সেখানে কন্যাশ্রীর জন্য একজন শিক্ষককে পুরো সময় দিতে হচ্ছে , তাকে একই সঙ্গে কম্পিউটার প্রশিক্ষিতও হতে হবে। এবার, একজন শিক্ষিকাকে যদি কন্যাশ্রীর জন্য আটকে রাখতে হয়, সাধারণভাবে শিক্ষকের অভাবে পীড়িত স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। সে প্রভাব হচ্ছে শিক্ষার মানে অবনমন, বা ছাত্রীদের কাঙ্খিত মানে পৌঁছে দিতে না পারা। এর মধ্য দিয়ে কন্যাশ্রীর ঘোষিত উদ্দেশ্যটাই পরাভূত হয়ে যায়। কোনো কারণে টাকা না ঢুকলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে

নানা কৈফিয়ত দিতে হয়, ফলে অনেকেই এ দায়িত্ব নিতে চান না। পঞ্চায়েত বা ব্লকেও যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় কন্যাশ্রীর কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য বেশ কিছু কাজ, যেমন তপশীলী জাতি জনজাতির সার্টিফিকেট তৈরি ইত্যাদি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আর হঠাৎ হঠাৎ চাপের ফলে বেশ কিছু গোঁজামিলও যে ঘটছে না এমনটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কন্যাশ্রী সম্পর্কে ২৫,০০০ টাকার প্রচার আছে; কিন্তু, এর জন্য যে মেয়েটিকে অষ্টম শ্রেণীতে নাম নথিভুক্ত করতে হতে পারে এ তথ্য সবার কাছে নেই। যে সমস্ত ছাত্রী নানা কারণে অনুপস্থিত থাকে তাদের কেউ কেউ বাদ পড়ে যায়। এটা আরও ঘটে যখন কোনো কারণে ছাত্রীর স্কুল বদল হয়। তাছাড়া প্রতি বছর পুনর্নবীকরণের যে দায়িত্ব থাকে সেখানেও গাফিলতি আছে। মাধ্যমিকে ফেল করলে পরবর্তী বছরে তারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে না বাইরে তা নিয়েও সংশয় থাকে। কন্যাশ্রী ২ পাবার সময় বেশিরভাগ ছাত্রীই কলেজে থাকে। সময় মতো স্কুল থেকে কলেজে অনলাইন ট্রান্সফার না হলে ছাত্রী বঞ্চিত হয়। এর ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু দুর্নীতি ও ঢুকে পড়ে। বিবাহিত মেয়েরাও কন্যাশ্রীর টাকা নিয়েছেন এমন ঘটনাও আছে। মেয়েটির অবিবাহিত থাকার পক্ষে সাক্ষর করেন পঞ্চায়েত প্রধান। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক

বদান্যতা দেখাবার জন্য তিনি দেখেও দেখেন না। আবার এমন কথাও শুনেছি যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও নথিভুক্ত হয়নি অর্থাৎ বিয়ের রেজেস্ট্রি হয়নি, অতএব কন্যাশ্রী পেতে তার অসুবিধা হবার কারণ থাকতে পারে না। এইসব কারণে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যটি নষ্ট হয়ে যায়।

উদ্দেশ্যের সঙ্কীর্ণতা ও পরিকল্পনার সংঘাত

কন্যাশ্রীর মতো পরিকল্পনার সদর্থক ও সার্থক রূপায়নের ক্ষেত্রে বাধা প্রকল্পের ভিতরেই আছে। দুই দশক আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত "মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনা কিসের? তার জন্য তো আমাদের নানা প্রকল্প রয়েছে"। রাষ্ট্রের কাছে ও মেয়ের জীবনে বিয়েই একমাত্র ভবিতব্য ধরা ছিল। কন্যাশ্রীতে কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করা এবং এর পরবর্তী রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত রূপশ্রী প্রকল্পতে বিয়ের জন্য অর্থ সাহায্যের মতো বিষয় ঘুরে ফিরে মেয়ের জীবনে বিয়েকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। বিয়ে বন্ধ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু স্কুলে পড়াশোনা করাটা একান্ত জরুরী। কিন্তু সেই পড়াশোনা থেকে স্বনির্ভর মানুষ হয়ে ওঠার দিকনির্দেশ কতটুকু?

আদিবাসী মেয়েদের ক্ষেত্রে কন্যাশ্রীতে নথিভুক্তিকরণ কম বলেই দেখা যাচ্ছে। এর একটি কারণ এটাই হতে পারে যে জনজাতি গোষ্ঠীতে স্বাভাবিক ভাবেই ১৫ বছর নাগাদ বিয়ে হয়, ছেলেদের ও কম বয়েসেই বিয়ে হয়, এক কালীন মাত্র ২৫০০০ টাকার জন্য এই ব্যবস্থা বন্ধ করা যায় কি? যেখানে সাধারণ ভাবে তথাকথিত মূলস্রোত এঁদের প্রায় অপাংক্তেয় করে রাখে, সেখানে হঠাৎ বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সক্রিয়তা সানন্দে গৃহীত না-ই হতে পারে। অন্যদিকে স্কুল জীবনকে দীর্ঘায়িত করার সম্ভাবনা জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য কতটা কার্যকরী ভাবতে হবে। বর্তমানের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় জনজাতি, দলিত, ও মুসলমান ছাত্রী, যারা সমাজের প্রান্তিক অংশ থেকে আসে, তাদের কাছে স্কুল একই সঙ্গে আশা ও হতাশা। যে আশা নিয়ে তারা স্কুলে আসে দিনে দিনে তা নষ্ট হয়। পাঠক্রম পরিবেশ, পরিকাঠামো, শিক্ষক কুলের আচরনের – বৈরিতার তালিকা দীর্ঘ। একটি সাঁওতাল মেয়েকে প্রথমে তো ভাষার গন্ডী পেরোতে হয়। স্কুল তার জন্য তৈরি করে রাখে এমন একটি পরিবেশে যেখানে কেউ তার ভাষা বোঝে না, তার সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অস্বচ্ছ, এবং

প্রায়শই ভুল; মূঢ় অজ্ঞানতায় তথাকথিত মূলস্রোতের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রী পর্যন্ত সকলেই আদিবাসীদের অবজ্ঞা করে, তাদের পশ্চাৎপদ বলে ধরে নেয়। লালিত অশিক্ষায় তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনা, আদিবাসীদের নীচু দেখিয়ে তারা নিজেরা কতখানি বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে – ভারতের মহান বৈচিত্র্যের এক অতি সমৃদ্ধ ধারা আদিবাসী জীবনযাত্রা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব থেকে।

পড়াশোনা এখন যেভাবে টিউশন নির্ভর, দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা অচিরেই পিছিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে জোটে "তোর দ্বারা জীবনে কিস্যু হবে না" এই ভাবনা। স্কুল ছুট হওয়ার হাজার একটা কারণ তৈরি হয়। তার উপর আসছে ফেল করানোর মতো অমানবিক উদ্যোগ। একা কন্যাশ্রী কত স্কুল-ছুট আটকাবে? পাঠক্রম ও শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনার আমুল পরিবর্তন না হলে কখনোই এই জাতীয় প্রকল্পের সার্থকতা আসতে পারে না।

একটি দলিত গ্রামে এক অভিভাবিকা জানালেন যে তাঁর একটি মেয়ে কন্যাশ্রীর টাকা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক হবার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে (এই প্রশিক্ষণ গুলিও অত্যন্ত ব্যয় বহুল)। কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, সে কোনো চাকরি পাবে না। মেয়েরাও গ্রামীণ পরিসরে দেখছে মেয়েদের স্বনির্ভরতার

কাহিনীটি আসলে সীমাবদ্ধ থাকছে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা, আশা কর্মী, বড় জোর নার্সিং পড়ে ছোটখাটো কাজ পাওয়াতে। খুব বেশি হলে শিক্ষিকা । এই মেয়েরা স্বপ্নেও ভাবে না বিজ্ঞানী হবে, পাইলট হবে, সর্বোপরি দেশ চালাবে। ফলে বিকল্প হয়ে ওঠে কিছু টাকা দিয়ে বিয়ে করে সংসারী হওয়া। ক্ষমতায়নের যে ভাবনা নিয়ে কন্যাশ্রীর যাত্রা, মেয়েদের শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি ও তার স্বপ্নের আকাশ কে প্রসারিত করার উপায় না হলে শেষ পর্যন্ত এটি সাময়িক ত্রাণের, এবং অবশ্যই নির্বাচনী প্রচারের উপাদান ছাড়া কিছুই হয়ে উঠবে না।

পরিশেষে, জনমোহিনী, ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে কোনো প্রকল্প প্রণয়ন মানেই যে সেটা খারাপ, আমি তেমনটা মনে করার কারণ দেখিনা। বরং উল্টোটা। জনমোহিনী প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার দিকটা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত এগোতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। যে সব পরিবারকে বছরের বেশির ভাগ দিনই অনটনে, খাদ্যের জন্য দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়, তাঁদের জন্য, মাসের মধ্যে এক সপ্তাহের খাদ্য সুরক্ষা একটা বড়ো ব্যাপার। এক সপ্তাহের সুরক্ষা মানে এক সপ্তাহের দুশ্চিন্তা কমা, এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত

সময় কিছুটা কমা। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল থেকে কোনো কোনো গবেষক এমনটা দেখেছেন যে, এই সামান্য সুরক্ষা থেকে লোকেদের সক্ষমতা এমন ভাবে বেড়েছে যে, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সরকারি দলকে চ্যালেঞ্জ করে বিরোধীদের সমর্থন জানিয়েছেন। তেমনি, সবুজ সাথী নামক হাইস্কুলে ভর্তি প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সাইকেল দেওয়ার প্রকল্প সামাজিক গতি-প্রকৃতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে জানা যাচ্ছে।

সমস্যা হল, ক্ষমতার মহিমা: সরকারে আসীন, এবং সরকারের বিরোধী উভয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের কাছে জনমোহিনী প্রকল্পগুলো ভোট ঘরে তোলার উপায়। বিরোধীরা সরকারের সমালোচনা করে এগুলোকে পাইয়ে দেবার রাজনীতি বলে উড়িয়ে দেন। সরকার দেখে, এর সাহায্যে তার ঘরে ভোট আসছে। ফলে, এ-ব্যাপারে সুস্থ, যুক্তিভিত্তিক বিতর্কের পরিসর গড়ে উঠতে পারেনা। এবং, সেই বিতর্ক ছাড়া জনমোহিনী প্রকল্পকে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য ব্যবহার করতে পারার সুযোগটাও আমরা হারাই। তথাকথিত অ-রাজনৈতিক নাগরিক সমাজ এই ফাঁক পূরণ করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত, কিন্তু যে নাগরিক সমাজ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার

ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারত, সেটা নিজেই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। প্রতিদিন দেখছি কন্যাশ্রীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপুল সম্ভাবনা কীভাবে সীমিত সুফলে আটকে যাচ্ছে। কন্যাশ্রীর পাশাপাশি যদি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো যেত, যদি এর রূপায়ণের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটা ব্যবস্থা থাকত, এর কেজো দিকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যদি এর নৈতিক-দার্শনিক দিকটার ওপর জোর পড়তো তাহলে পঁচিশ হাজার টাকার প্রকল্পটি স্বর্ণ-প্রসবিনী হয়ে উঠতে পারত। সেটা এখনও সম্ভব। কিন্তু তার জন্য সমাজকে প্রথাগত দ্বৈত থেকে বেরোতে হবে, এটা হয় খুব ভাল, না হয় খুব খারাপ, এই মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। সরকারকে যেমন দাবির ভঙ্গীটা বদলাতে হবে তেমনি বুদ্ধিচর্চার সঙ্গে যুক্ত সমাজ সহ সমস্ত বিরোধীদের সমালোচনার রূপ বদলাতে হবে। কন্যাশ্রী নিয়ে সমালোচনা যদি এই হয় এটা পাইয়ে দেওয়ার প্রকল্প, তাহলে এ প্রকল্পের রূপায়ণে যেমন উন্নতি ঘটেনা, তেমনি রাজনীতি ও সামাজিক নীতি নির্ধারণের মানেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। কিন্তু, যদি বলা হয়, এ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হোক, ত্রুটিগুলো দূর করা হোক, এবং সর্বোপরি প্রকল্পটাকে একটা বৃহৎ সামাজিক অগ্রগতির অঙ্গ হিসেবে দেখা হোক, তাহলে এর রূপায়ণের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত

মানুষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে এগোনোর সুযোগ প্রসারিত হতে পারে। কন্যাশ্রী যে প্রধানত একটা বিয়ে আটকানো প্রকল্প হিসেবে আটকে থেকে যাচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যের। পুরো সরকারি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমতা ও সমদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে, এবং সেই ভাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটালে কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প সমাজকে অন্যভাবে ঢেলে সাজাতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Late Krishna Bhattacharya

Distinguished Teacher of Education,
West Bengal Education Service

Anil Mistri
Working for Girl Child Education,
Sundarbans, West Bengal

Bhanu Baske
Working for Women's Education in
Birbhum District, West Bengal

Shahina Javed
Working for Women's Football Team and
Other Sports Activities at Rajabazar, Kolkata

Bharati Chowdhury Memorial Award ,
to **Banbibi Jatra Sangstha**
Balidweep, Sundarban, West Bengal

Sixth Krishna Memorial Awards for Women Educationists,
Students and Care givers were conferred on

a)Anil Mistri, Educationist b) Bhanu Baske, Educationist
c) Shahina Javed, Sports Activities and d) Banbibi Jatra Sangstha

By **Anita Sengupta,** Director, CRG
on
4 January 2019

Krishna Trust

HB-232, First Floor, Sector-III, Salt Lake
Kolkata-700 106, Phone +91-33-23371801